Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শওকত আলীর উপন্যাসে দেশভাগ: বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধান

Volume	60
Issue	3
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Angur Hossain
Published online	November 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.6
Pages	97-119
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.6
প্রবন্ধ জমাদান: ২৩ মার্চ ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৯৭-১১৯

শওকত আলীর উপন্যাসে দেশভাগ: বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধান

মো. আঙ্গুর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: angurba7du@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার বছরের ভৌগোলিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এক বেদনাবিধুর চেতনাসমৃদ্ধ অনুষঙ্গ। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির কূটচালে অখণ্ড ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়, যা দেশভাগ নামে পরিচিত। বৈদিক যুগের প্রাক-আর্য থেকে ১৯৪৭ সালের পূর্বপর্যন্ত নানা ভিনদেশি শাসক, বিজাতি, বিভাষী ও বিধর্মী ভারতভূমি শাসন ও শোষণ করেছে। ব্রিটিশরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে জাতি ও ধর্মের নামে যে দুইটি দেশের সৃষ্টি করেছে, তা সংকটে ফেলেছে বঙ্গভূমিকে, বঙ্গভাষাকে এবং বাঙালি জাতিকে। এই দেশভাগ নীতির ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে অখণ্ড বাংলায়। দুই দেশের জনজাতি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি পেলেও তারা হারিয়েছে নিজেদের জাতিসত্তাগত পরিচয়। যে বাঙালি জাতি সর্বদা তার আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ব অনুভব করেছে, এর ফলে সে সত্তাগত অস্তিত্ব-সংকটে পড়েছে। এসব বিষয় শওকত আলীর *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *উত্তরের খেপ* (১৯৯১), *স্বাসে প্রবাসে* (২০০১), *বসত* (২০০৫) ইত্যাদি উপন্যাসে উঠে এসেছে। লেখক পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। তিনি ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি নিয়ে রচনা করেছেন এসব কালজয়ী উপন্যাস। এগুলো শৈল্পিক কাঠামোতে ঋদ্ধ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ। এসব রচনায় ঔপন্যাসিক বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এতে আলোচিত হয়েছে লেখকের নিজের জন্মভূমি ত্যাগের যন্ত্রণা এবং মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিন্তা ও সামাজিক মূল্যবোধের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। এসব উপন্যাসে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূল অনুসন্ধানে অনুসৃত হয়েছে ঐতিহাসিক গবেষণাপদ্ধতি। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় অন্বেষণের সূত্র ধরে আলোচ্য প্রবন্ধে দেশভাগের যন্ত্রণাময় অনুভূতি এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মূলশব্দ

দেশভাগ, বাঙালি, আত্মপরিচয়, জাতিসত্তা, অসাম্প্রদায়িকতা, আত্ম-আবিষ্কার, অস্তিত্ব-সংকট, রাজনৈতিক দর্শন, স্বাধীনতা ও মুক্তি।

১

জীবনাভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) জীবন ও জগতের নানা দর্শনকে সূক্ষ্মভাবে ও সুচিন্তিতভাবে অনুধাবন করে কথাসাহিত্যে রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বেদনাময় স্মৃতিতে উদ্ভাসিত শওকত আলীর ব্যক্তিজীবনে। ভারতবর্ষের সমগ্র বাঙালির অস্তিত্বে নেতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এই বিভাজন-নীতি। শওকত আলী নিজেও মুখোমুখি হয়েছেন সেই সময়ের নেতিবাচক প্রভাবের। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল ওই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা সম্পর্কে; যা নানাভাবে উঠে এসেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে। লাহোর প্রস্তাবকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে পরিবর্তন করা হয়েছে, তা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। গোষ্ঠীস্বার্থের কারণেই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বাংলাকে। এতে অসংখ্য মানুষ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার জন্মভূমি, অতীত ঘটনাবহুল স্মৃতি ও আজন্ম লালিত স্বপ্ন থেকে। এই বিভাজনের ফলে শওকত আলী নিজেও বাধ্য হয়েছেন সপরিবারে জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জ ত্যাগ করতে। তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দিনাজপুরে চলে আসেন পরিবারের সাথে। অবশ্য তিনি আন্তরিকভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরেছিলেন নতুন দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে। কিন্তু দেশভাগের কারণে তিনি যে পীড়নের শিকার হয়েছেন, তা মেনে নিতে ও ভুলতে পারেননি। তাঁকে সবচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ফেলেছে বঙ্গবিভাজন নীতি। এ কারণে তিনি ব্যক্তিজীবনে নানাবিধ অপ্রত্যাশিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। দেশভাগের নেতিবাচক ফলাফল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওপর ফেলেছে ক্ষতিকর প্রভাব। উত্তরাধিকারসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা স্বদেশ-স্বভূমি একটি বিভাজন নীতির প্রভাবে চোখের নিমেষে পরদেশ হয়েছে। লেখকের জীবনে নিরাপত্তাহীনতার সংকট জোরালো হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ আশা-স্বপ্ন হয়েছে কালো মেঘের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময় রাতের অন্ধকারে ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে অনেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সীমান্তে তাদের ওপর নেমে এসেছে অসহনীয় নির্যাতন, অন্তহীন বৈষম্য ও অবর্ণনীয় অত্যাচার। এক ধরনের স্বার্থান্বেষী, লোভী, বিবেকহীন মানুষ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ও সহায়সম্পত্তি কিনে বা দখল করে নেয় নামমাত্র দামে। তারা হয়েছে উদ্বাস্তু। নতুন ও ভিন্ন পরিবেশে তাদেরকে টিকে থাকতে হয়েছে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কেউ কেউ সফল হলেও অনেকের জীবনে নেমে এসেছে অসহ্য যন্ত্রণা, বেদনা, হতাশা, দুঃখ ও দারিদ্র্য। বাকি জীবন তাদেরকে অতিবাহিত করতে হয়েছে চরম অস্বস্তি ও অন্তহীন মানসিক সংকটে। এই উদ্বাস্তু বাঙালি নতুন পরিবেশে স্বীকৃত হতে পারেনি আত্মপরিচয়ে। তাই তাদের কখনো মেলেনি আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর। এজন্য তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে, যার প্রভাব বিরাজ করেছে উত্তরপ্রজন্মের মধ্যেও। এরা মানসিকভাবে হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত; যা তাদের সামগ্রিক জীবনে বয়ে এনেছে নেতিবাচক ফলাফল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, নষ্ট হয়েছে তাদের আবেগ-অনুভূতি। বন্ধুত্ব ও প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্কও রূপ নেয়নি স্থায়ী কোনো সফলতায়। দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাসে শওকত আলী দুঃখজর্জরিত অভিজ্ঞতানির্ভর সত্যাসত্য তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন:

> বহু উপন্যাসে চরিত্রের মানসজটিলতা তৈরিতে লেখক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন দেশবিভাগের অনুষঙ্গ। দেশবিভাগের পটভূমিতে লেখা এসব উপন্যাসে বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মআবিষ্কারের বিষয় চিত্রিত হয়েছে। (হুসাইন ২০১৬: ৭২)

শিক্ষাদীক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ওই সময়ের বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্ম-আবিষ্কার ও বিকাশের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) উপন্যাসে। বাংলার মুসলমান পিছিয়ে ছিল অর্থবিত্ত, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চাকুরি ও রাষ্ট্রক্ষমতা ইত্যাদি সব দিক থেকে। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পতন ও দ্রুত নগরায়ণ এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের ভেতর থেকে লক্ষ করা যায় ধনিক শ্রেণির ক্রমবিকাশ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সুবিধাবাদী শ্রেণির উদ্ভব, সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি এই উপন্যাসে লক্ষণীয়। *উত্তরের খেপ* (১৯৯১) উপন্যাসে দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার গতিপ্রবাহ ব্যক্তির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে দেখানো হয়েছে। *স্ববাসে প্রবাসে* (২০০১) উপন্যাসে দেখা যায়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মুহূর্তের মধ্যে নিজ বাসভূমে পরবাসী করে পরিণত করেছে শেকড়হীন সত্তায়। *বসত* (২০০৫) উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান। দেশভাগের ফলে ভূমি ও স্মৃতিসত্তা থেকে আলাদা হওয়া মানুষের অস্তিত্বের সংকট, ভয়, আশ্রয়সন্ধানী যন্ত্রণাকাতর মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। শওকত আলীর এসব উপন্যাসে দেশভাগ প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে:

> শওকত আলীর উপন্যাসে জীবনের ভাঙাগড়া, তাঁর লড়াই ও রক্তক্ষরণের নেপথ্যে প্রায়ই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতাকে। দেশবিভাগের প্রবল ধাক্কায় অগণ্য নর-নারীর জীবনে নেমে আসে মর্মন্তুদ বিপর্যয়, আজন্মের ভিটেমাটি ছেড়ে একমুহূর্তেই উদ্বাস্তু শরণার্থীতে পরিণত হয় সীমান্তের দুইপারের মানুষ। ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার ছায়াও দুর্লক্ষ্য নয়। (চঞ্চল ২০১৫: ১১০)

শওকত আলীর দেশভাগকেন্দ্রিক ওপরে উল্লেখিত উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-আবিষ্কারের স্বরূপ। এই প্রবন্ধে বাঙালির রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও আত্ম-আবিষ্কারের প্রতিবন্ধকতা, বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক স্বরূপ, বাঙালির আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাজনিত মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং সীমান্তে দেশত্যাগরত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আঘাত ও প্রত্যাঘাত ঐতিহাসিক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ঘটনা এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক পটপরিবর্তনকারী অনুষঙ্গ। এই দেশভাগের অন্তর্নিহিত ইতিহাস, স্বরূপ ও কার্যকারণ-সূত্র বিশ্লেষণ করার পূর্বে এর তত্ত্বীয় দর্শন ও পরিপ্রেক্ষিতের পরিচয় উল্লেখ আবশ্যক। 'আধিপত্যবাদ' নামক অভিধাটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধুনা বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় মতবাদ। যাযাবর মানুষ পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে একদিনে গড়ে তোলেনি গ্রাম, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র। যখন তাদের মধ্যে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ ও বশীভূত করার অভীপ্সা জেগে উঠেছে,

তখনই তারা ব্যবহার করেছে আধিপত্যের। এ থেকেই তাদের সত্তায় জন্ম নিয়েছে আধিপত্যের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। তারা চিন্তা করেছে নিজেদের শাসননীতি এবং নিয়ন্ত্রণের নানা কলাকৌশল সম্পর্কে। পরবর্তী সময়ে তাদের এই শাসননীতি ও নিয়ন্ত্রণনীতি পরোক্ষভাবে রূপ নিয়েছে স্বরাষ্ট্রভাবনায়। প্রবল 'আধিপত্যকামিতা'র জন্যই যে কোনো রাষ্ট্রকাঠামোকেও বাস্তবে রূপদানের জন্য সূচিত হয় বড়ো ধরনের পরিবর্তন। ঠিক এমনই মনোভাব দৃশ্যমান হয়েছে দেশভাগের সময়ে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল 'আধিপত্যকামিতা'র সুপ্ত বাসনা। দেশভাগের ক্ষেত্রে আর একটি অনুষঙ্গ খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটাকে বলা চলে 'মাইনরিটি' (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অর্থে)। এই শব্দটি ভারত-পাকিস্তানের জনমানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই চিন্তা-কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের কিছু স্বার্থান্বেষী, আত্মকেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা চরিতার্থ করেছে। 'মাইনরিটি'র অভিধাটিকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের অভীপ্সা পূরণ করেছে। এতে বাঙালির আত্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব ও জন্মভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উভয় অংশের জনমানুষ বাধ্য হয়েছে প্রাণরক্ষার জন্য অন্যত্র আশ্রয় নিতে। জীবনের আজন্ম-লালিত আবেগ, অনুভূতি ও জীবনস্মৃতিকে পরিত্যাগ করে পাড়ি জমাতে হয়েছে অনিশ্চয়তায় ভরা অজানা ঠিকানায়।

'দেশভাগ' বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কিছু শব্দবন্ধ যেমন—'দেশত্যাগ', 'দেশহারানো', 'দেশবদল', 'দেশচ্যুতি', 'দেশছাড়া' প্রভৃতি। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বৃহৎ ঘটনা। কার্যত, এই দেশভাগের ফলে অখণ্ড ভারতবর্ষের তিনটি ভূখণ্ড দুইটি আলাদা রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান, ১৫ই আগস্ট ভারত ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়ার সঙ্গে দেশভাগের ইতিহাস প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। প্রচলিত মত এই যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে দেশভাগ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ঘটনাকে বাংলাভাগের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে বিভক্তির সূচনা ঘটেছিল, ১৯১১ সালে রদ হলেও, ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ১৯৪৭ সালে এসে তা চূড়ান্ত রূপ পায়।

১৯৪৭ সালকে 'দেশভাগ' নাকি 'বাংলাভাগ' বলা যাবে, তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতভেদ ও বিতর্ক। দেবেশ রায় মনে করেন, রাষ্ট্রের একটা প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব থাকবে; কিন্তু দেশচেতনার সঙ্গে জড়িত অনুভূতি। সে অর্থে দেশচেতনা কোনো রাষ্ট্রধারণা বা শাসন-ধারণার সাথে সম্পর্কিত নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় কংগ্রেস-কথিত 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদে'র পরিবর্তে ভারতকে বিভক্ত করা হয়। এই ধারণায় 'দেশভাগ'কে যদি 'ভারতভাগে'র প্রতিরূপ বিবেচনা করা হয়, তবে তার মধ্যে 'ঔপনিবেশিকতার মানসিকতা'কে এড়ানোর সুযোগ নেই। বর্তমানে এ কথা খানিক মীমাংসিত যে, বাংলার দুই অংশ এক দেশভুক্ত নয়। যদি বাংলার দুই অংশ এক দেশভুক্ত হতো, তাহলে দেশত্যাগ বা বদলের প্রসঙ্গ হয়তো উঠত না। এ কারণে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতীয় বঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের সাথে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এই দুই বাংলার মানুষের ভাষা এক হলেও তা প্রয়োগের

ক্ষেত্রে, কিংবা ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসংখ্য বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। দেশভাগের পটভূমি কেমন ছিল, তা ঐতিহাসিক স্বীকৃত বিষয়, তবে সে সম্পর্কে জানার জন্য একজন চিন্তকের ধারণা এখানে উল্লেখ করা হলো:

> দেশভাগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার ঐতিহাসিক আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। তবে এ বৈষম্য ছিল প্রধানত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। যেমন শিক্ষায় চাকরিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূস্বামিত্বের ক্ষেত্রে। বৈষম্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গদেশে ছিল প্রকট। নবাবী বাংলা থেকে ব্রিটিশ বাংলা হয়েই ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা। সূচনালগ্নে রাজধানী কলকাতাকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেওয়ানি-এজেন্সি থেকে অর্থাগমের যে রমরমা সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা হিন্দু বণিক, ভূস্বামী ও শিক্ষিত শ্রেণীর দ্রুত বিকাশ ঘটায়। নবাগত শাসনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াসহ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াটাও বাঙালি মুসলমানের জন্য ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে। (আহমদ ২০১৫: ৪১৪)

পূর্ববাংলার তথা বাংলাদেশের জনমানুষের নিকট বিভিন্ন কালপর্বে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলার মানুষ দেশভাগকে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আবার পূর্ববাংলায় ষাটের দশকে এই দেশভাগ পাকিস্তানি শাসকশক্তির বিপরীতে এখানকার জনমানুষ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র চেতনায় বিচার করেছে; যার মধ্যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জাতীয়তাবাদী চেতনা লুকানো ছিল। দেশভাগের পেছনে যে কারণই বিদ্যমান থাকুক না কেন, এটা যে দুই বাংলার মানুষের জীবনে অমানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তা কারো অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যার ফলে প্রকট হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অমানবিক উদ্বাস্তু সমস্যা; যা বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে দেশভাগের প্রক্রিয়াগত যে ত্রুটি ছিল, তা এ অঞ্চলের জনমানুষের নিকট যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি অধুনা নানা গবেষণায় তার ঐতিহাসিক কার্যকারণ-সূত্র উঠে এসেছে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পেছনে সক্রিয় ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তি। কারণ রাজনৈতিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, যেহেতু ১৯৪৭ সালে দুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, সেহেতু এটাকে নতুন সীমানা নির্ধারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর সেই গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন ব্রিটিশ কর্মকর্তা সিরিল জন র‍্যাডক্লিফ। ঐতিহাসিক বিচারে ব্রিটিশরা নতুন রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনশুমারিতে প্রদত্ত ধর্ম-সম্প্রদায় ও বর্ণ-পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছিল। কিন্তু এর পরেও অনেক হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল পাকিস্তান বা পূর্ববাংলাভুক্ত হয় এবং আবার অনেক মুসলিম-অধ্যুষিত ভূভাগ ভারতের অধীনে যায়। এর ফলস্বরূপ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> In 1947, Bengal was partitioned again, following horrific clashes between Hindus and Muslims. On the occasion, however, hardly a voice was raised in protest. On the contrary, the second and definitive partition of Bengal was preceded by an organized agitation which demanded the vivisection of the province on the basis of religion. This

> movement was led by the very same section of Bengali society that had dominated its nationalist politics since the time of Bengal's first partition: the so-called bhadralok or 'respectable people.' (Chatterji 1994: 01)

এ কারণে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ঘটনা যতটা না দেশচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার চেয়ে অধিক রাষ্ট্রধারণার সাথে সম্পর্কিত। এ বিচারে দেশভাগকে 'রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিতকরণ' বা 'নতুন রাষ্ট্রসীমা' বলা যেতে পারে। দেশভাগের কারণে শুধু বাংলা অঞ্চল যে বিভক্ত হয়েছে তা নয়, পাঞ্জাব প্রদেশও বিভক্ত হয়েছে। পাঞ্জাবে দেশভাগ মানে দাঙ্গা, গণহত্যা, নির্যাতন, নারী-অবমাননা, দেশত্যাগ ও দেশহারানোকে বোঝায়। সেজন্য পাঞ্জাবের দেশভাগের সাহিত্যে সে কালের হত্যা ও নির্মমতার চিত্র দেখানো হয়েছে। এই দেশভাগ বিশেষ করে বাঙালির জীবনে আত্মপরিচয়গত সংকটে ফেলেছে। সংখ্যালঘু পরিচয় তথা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার ফলে সমস্যা প্রবল হয়েছে:

> দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে সমাজবিকাশের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হলেও জাতীয় রাজনীতির অন্তর্নিহিত বাস্তবতা শোষককুলকে বারবার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হলেও শাসনসূত্র হিসেবে তার আবেদন গৌণ হয়ে পড়েছিলো জনমানসে। (রফিকউল্লাহ ২০১৯: ১১৩)

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা অঞ্চল ভাগ হওয়ায় পূর্ববাংলার বাঙালি প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা নানা ক্ষেত্রে শিকার হয়েছে অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক বিরোধের সূত্রপাতও হয়েছে দেশভাগকে কেন্দ্র করে; যা পরবর্তীকালে মর্মান্তিক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিয়েছিল। এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে। অন্যতম আর একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়াকে। তা ছাড়া মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবেও হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে সমাজে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ধরনের প্রবল উদাসীনতা বিদ্যমান থাকায় সামাজিক দ্বন্দ্ব আরো বেশি প্রকট আকার ধারণ করে। এজন্য তাদের সামগ্রিক জীবনে নেমে আসে নানাবিধ সংকট, দুর্দশা ও দুরবস্থা। দেশভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবের আধিবাসী।

তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে অখণ্ড বাংলার সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। কলকাতাকে বিবেচনা করা হতো নাগরিক কেন্দ্র হিসেবে। কারণ সেখানে উচ্চশিক্ষার নানা ধরনের সুযোগ ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি কলকাতায় গমন করে এই সুযোগ গ্রহণের জন্য। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসে। কিন্তু নিজ বাসভূমি ছেড়ে কলকাতায় তারা নানাভাবে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। তারা তাদের পূর্বপুরুষের ফেলে আসা জমি, বাড়িঘর ও সহায়-সম্পত্তিকে কোনোভাবে ভুলতে পারে না। তাদের মধ্যে ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি জমিদার। নানা প্রচেষ্টায় কলকাতায় এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কাজ ও চাকরির সুযোগ পায় সীমিত পরিসরে। কিন্তু নতুন ভূখণ্ডের ভিন্ন পরিবেশে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ভেঙে যায়। এই দেশবিভাজন

নীতি শুধু তাদের ভৌগোলিক সীমারেখাকে পৃথক করেনি, বরং তাদের চিন্তা-চেতনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। অবশ্য এর আগে এই বাঙালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মন্বন্তরের কারণে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে। নতুন করে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারাল এবং নতুন পরিবেশে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নিপতিত হলো; যার প্রভাবে উভয় বাংলার বাঙালিদের আত্মপরিচয় সঙ্কটাপন্ন হয়েছে। এ সময় যেসব জনমানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে, তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে:

> দেশভাগের পরিণাম সম্প্রদায়গত বিভাজন ঘটিয়েই শেষ হয়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক বিভেদের জন্ম দিয়েছে। ভাগ্যতাড়িত একশ্রেণীর মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের নাম 'রিফিউজি' তথা বাস্তুবাদী। পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত এ ট্রাজেডির বিস্তার। তবে স্বধর্মীয়দের আঞ্চলিক মানসিক বিভাজন একমাত্র তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে। একে বাঙ্গাল, তায় বাস্তুবাদী। আর সে জন্য স্বধর্মীর অবজ্ঞা থেকে আপন হীনমন্যতার মধ্যেই জন্ম নেয় তাদের প্রতিবাদী চেতনা বা রাজনীতিকেও স্পর্শ করে। (আহমদ ২০১৫: ৪৩৮-৪৩৯)

সুতরাং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সঙ্গে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক নানা কার্যকারণ-সূত্র জড়িত এবং দেশভাগ যে এককভাবে 'বাংলাভাগ' নয়, সে ধারণাও সুস্পষ্ট।

৩

এ গবেষণায় যেহেতু বাঙালির জাতিসত্তাগত পরিচয় অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে, সেহেতু এই বয়ানে বাঙালির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় অনুপস্থিত থাকবে। এখানে বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিচয় নিয়ে প্রাসঙ্গিক সূত্র উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বাঙালির 'আত্মপরিচয়' বলতে বোঝায় বাঙালির একান্ত নিজস্ব পরিচয়কে। আর বাঙালির 'আত্মজিজ্ঞাসা' হলো নিজের অস্তিত্বে টিকে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। খুব সাধারণভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় বাঙালি কারা, তবে এর উত্তরে বলতে হয়, তারাই বাঙালি যারা তাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষা-উপভাষা ব্যবহার করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে তোলে। অন্যভাবে 'বাংলা ভাষার স্পষ্টভাবে গ্রাহ্যরূপ ব্যক্ত হওয়ার অনেক আগেই যারা প্রত্ন-বাংলা কিংবা তারও অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাচনিক প্রকাশ-মাধ্যম সামূহিক ভাবে ব্যবহার করত, সেই ভূমি-সংলগ্ন জনসাধারণই আদি-বাঙালি' (তপোধীর ২০২২: ২৯)।

প্রথমেই বাঙালি জাতির পরিচিহ্নায়নের জন্য তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ভিত্তি, অর্থনৈতিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো জানা ভীষণ জরুরি। ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির উৎস-নির্মাতা মনে করা হয় বৈদিক সভ্যতার লোকপ্রচলিত আর্য-জাতিকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই আর্য-জাতির পরিচয় আধা-বর্বর জাতি হিসেবে। উপমহাদেশে 'বৈদিক যুগের শেষভাবে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশে আর্য্য উপনিবেশ ও আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়' (রমেশচন্দ্র ২০২৪: ৩২)। তবে এই আর্য-জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় হলো 'আদি-নর্ডিক' বা 'ইন্ডিড'। তাদের আগমনের পূর্বে এ উপমহাদেশে বিদ্যমান ছিল স্থানীয়দের পূর্বতন সমাজ,

সভ্যতা ও সংস্কৃতি; যা তাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে এখানকার স্থানীয় মানুষ গ্রহণ করেছে নানা কারণে। কিন্তু স্থানীয়দের ওপর যখন আর্যদের অত্যাচার-নির্যাতন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছাত, তখন তাদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা যেত। এ সময় তারা সাহায্য দাবি করত বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ওপর। এভাবে যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে নতুন নতুন বহু নেতার; যারা পালন করেছে দেবতার মতো ভূমিকার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচিত আজীবক, তীর্থঙ্কর ও বোধিসত্ত নামে। অবশেষে দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে তারা অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর তখন বাঙালি জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে উত্তরভারতীয় আর্যভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, সমাজ ও নীতি গ্রহণ করে সভ্য হয়ে উঠেছে। তবে কিছু শব্দ, কিছু বাক্‌রীতি, কিছু আচার সংস্কার ছাড়া বাঙালির অন্যসব বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। এভাবে বাঙালি যুগে যুগে ধর্ম, সমাজনীতি, পোশাক, প্রশাসনিক নিয়ম, আচরণ ও আদর্শিক জীবনের প্রায় সবকিছুই বিদেশ, বিজাতি ও বিভাষা থেকে সংগ্রহ করেছে। এ কারণে 'বাঙালীরা চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনো অবলুপ্ত হয়নি এবং তা একাধারে লজ্জার ও গৌরবের।' (আহমদ শরীফ ২০০১: ১৮)

বাংলাদেশের জনপ্রবাহে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন। এ কারণে বাঙালি জাতিকে সংকর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাঙালির রক্তে মোঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ মিশেছে। তা ছাড়া এখানে বিদেশি বিভিন্ন জাতি ইরান-তুর্কিস্তানের শক জাতি, সপ্তম শতকে সমতট অঞ্চলে খড়গ রাজবংশ, দশম শতকে গৌড়ে কম্বোজাখ্য রাজবংশ, একাদশ শতকে অন্ধ্র থেকে আগত বর্মণ রাজারা, দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজারাসহ তাদের সাথে আগত কর্মচারীর রক্ত বাঙালির রক্তের সঙ্গে মিশেছে। বাংলা অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে মুসলিম শাসনাধীনে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তখন থেকে ইংরেজ শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত ভাগ্যান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী তুর্কি, পাঠান, মোগল, ইরানীয়, আরবীয়, আবিসিনীয় শাসক, কর্মচারী, সৈনিক ও ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে এসেছে বাঙালি। তা ছাড়া ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপীয় জাতি—পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, এমনকি আরাকানের মগ দস্যুদের রক্তও বাঙালির রক্তে মিশে থাকতে পারে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে পাকিস্তান এবং এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মুসলিম পরিবারের আগমন ঘটে বাংলায়। এভাবেই হাজার বছর ধরে বাঙালির জনপ্রবাহে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ ঘটেছে।

বাঙালির জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। যার প্রভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটেছে। বাংলার ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানের বাংলা আক্রমণের ঘটনাও এর ব্যক্তিক্রম নয়। এটাকে তৎকালীন ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক পালাবদল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণ ও বিজয় পরবর্তীকালে জনমানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এ সময় জনমানুষের একটা অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙালি মুসলমানের আগমন সম্পর্কে দুই ধরনের মত প্রচলিত। প্রথম মত এমন যে, বাঙালি মুসলমানেরা মূলত আরবীয়, ইরানীয়, তুর্কি, আফগান, মোগল ও আবিসিনীয়দের বংশধর এবং অষ্টম শতক থেকে আরবীয়-বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে আগমন করে। তা ছাড়া দ্বাদশ শতকে অসংখ্য আরবীয়-ইরানীয় সুফি, মুসলিম শাসনাধীনে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আসে। মুহম্মদ আবদুর রহিমের মতে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বহিরাগত মুসলমান এবং শতকরা ৭০ ভাগ স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান (উদ্ধৃত, আবুল কাসেম ২০২৩: ৬৬)। বাঙালি মুসলিম সম্পর্কে দ্বিতীয় মত এমন যে, মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা এ দেশেরই বাসিন্দা। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধ, হিন্দু ও অপরাপর ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া আরব-ইরান ও উত্তর ভারত থেকে স্বল্প সংখ্যক সুফিদের প্রভাবে বাঙালি মুসলমানের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিকরা একটি বিষয়ে একমত যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর নরগোষ্ঠীতে কোনো পার্থক্য নেই। বাঙালিদের মধ্যে সমাজে যে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আর্য-অনার্য সমন্বয়ের সময় গায়ের রঙের ভিত্তিতে হয়েছে। আবার সমাজে যে প্রচলিত জাতিভেদপ্রথা চালু ছিল, তা আদিতে এমন ছিল না, এটা হয়েছে সমাজের কর্মবিভাগের কারণেই। এরপর ১৭৫৭ সালে ঘটেছে ইতিহাসের আর এক বড়ো ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল। এ সময় এক শ্রেণির বাঙালি চিরদিনের মতো তাদের আত্মপরিচয়কে প্রবলভাবে অবজ্ঞা করেছে। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের স্বভাব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এমন:

> অনাদিকাল থেকে সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিষাক্ত-চক্র বাঙালি প্রাণের মূল্যবোধকে পলে পলে ধ্বংস করতে কাজ করেছে। ফলে ইতিহাসের ঘুরপাকে বাঙালিকে আমরা দেখতে পাই একটি নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ ও নিস্পৃহ জাতিরূপে। (আবুল কাসেম ২০২৩: ৯৭)

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পরে বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বৃহৎ পালাবদল ঘটেছে। এ সময় এক শ্রেণির বাঙালি ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য ইংরেজ-সরকারের অনুগত হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে বাঙালির শাসনক্ষমতা প্রায় দুশো বছরের জন্য ইংরেজ-সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

অবশ্য বাঙালি জাতির সমাজকাঠামোর দিকে নজর দিলে, চোখের সামনে হাজির হয় বাঙালির সমাজব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতির ব্যাপক বিবর্তিত ও রূপান্তরিত রূপ। বাঙালির সমাজে তিনটি প্রধান স্তর বিদ্যমান ছিল, সেগুলো হলো—কৌম সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে সুবহ-ই-বঙ্গালাহ গঠিত হয়। এ সময় থেকেই বাঙালি জাতি হিসেবে প্রথম স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা পেয়েছে। বাংলায় মৌর্য অধিকারের পূর্বেই কৌমতন্ত্র চালু ছিল। তাদের ক্ষমতায় আসার পরেই তা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। কৌম সমাজে বাঙালির জীবিকার উপায় ছিল পশু শিকার, মৎস্য শিকার, ফলমূল আহরণ, কৃষি ও গৃহনির্মাণ প্রভৃতি। আর্যীকরণের পূর্বে বাংলায় যেসব সংস্কার, বিশ্বাস ও ধর্মাচরণ বিদ্যমান ছিল, তা পরবর্তীকালে বাঙালি হিন্দুদের ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। বাংলার কৌমতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পঞ্চায়েত প্রথার প্রচলন ছিল; যার মধ্যে

গণতান্ত্রিক চর্চা ছিল। শশাঙ্ক, পাল ও সেন আমলে বাংলায় 'গৌড়রাজ্য' গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পাঠান সুলতানদের শাসনামলে 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালা' নামে সমস্ত ভূভাগ একত্রিত হলে বাঙালি জাতি হিসেবে প্রথম আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি ঘটে। অবশ্য আর্য-জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির নিকট বঙ্গ ও এর অধিবাসীরা ছিল অবহেলিত ও অবজ্ঞাত।

কৌম শাসনব্যবস্থার অবসান থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলে প্রায় তেরোশো বছর পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার সমাজ রূপান্তরিত হয় ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। সামন্ত সমাজের যে দুইটি ধারা ছিল, সেখানে মধ্যশ্রেণি নামক কোনো ধারা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনামলে ইউরোপীয় বণিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বাংলায় পুঁজিপতি মধ্যশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই বাঙালি মধ্যশ্রেণি বাংলার ক্ষমতা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। এ সময় ব্রিটিশ সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণির লোকেরা সরকারি চাকরি, দেশীয় প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জমিদারি প্রাপ্তির মতো প্রভৃতি সুবিধা পেতে থাকে। এ সময় ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটলে তার প্রভাব বাংলায় এসে পড়ে এবং বাঙালির স্থানীয় বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। অন্যদিকে কিছু বাঙালি মনীষী ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ ও জীবন গঠনে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। তাঁরা জ্ঞানে, চিন্তায়, রসবোধে, মুক্তচেতনায়, সাহস, সততা ও কর্মক্ষমতায় নবজাগরণের সূচনা করেন। এক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু নবজারণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কারণ এ সময় বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিকে সাদরে গ্রহণ করে সুফল পেতে থাকে। এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানরা ঔপনিবেশিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকেছে। তারা পূর্বজ প্রাচীন ধ্যানধারণা ও প্রাচীন শিক্ষা নিয়েই ছিল। ফলে সামাজিকভাবে একই সাথে বসবাসরত বাঙালির দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সৃষ্টি হয়। তবে বাঙালি মুসলমান বিশ শতকের শুরুর দিকে রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ব্রিটিশদের শাসন ও শোষণ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়। ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব কোনো কোনো জায়গায় পরিলক্ষিত হয়; এর ফলে কয়েকটি দাঙ্গার সূচনা হয়।

বাঙালি ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি রাষ্ট্রের পৃথক অধিবাসী হয়। এরপরে ১৯৭১ আবার বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিক হয় বাঙালির একটা অংশ। বাঙালি জাতি তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পায়। তবে বাঙালি যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র পায়, তাতে ঔপনিবেশিক আমলের আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো বিদ্যমান থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মের সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তার কোনো বিরোধ নেই। বাঙালি জাতিসত্তার মৌলিক সত্তা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আপাতত আমাদের জাতিসত্তার মৌলিক সত্য সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন সগৌরবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়: বাঙালির কোনো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টীয় হয় না। আমাদের আত্মপরিচয়ের একমাত্র অভিজ্ঞান বাঙালিত্ব' (তপোধীর ২০২২: ১৯)। অতএব, ধর্মের কিংবা দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে বাঙালিকে পৃথক করা হলেও জাতিসত্তার কেন্দ্র এক ও

অভিন্ন। সেজন্য ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় বাঙালি ঐতিহাসিকভাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়েছে।

৪

ভারতবর্ষের যে বাঙালি প্রায় দুইশ বছর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, তারা সেই ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থেকেছে। পরাধীনতার গ্লানি মোচনের নিমিত্তে যেসব বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, তাদেরই আবাসভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। তবে উদ্দেশ্য যাই থাক, জাতিগত আত্মপরিচয়ের সংকটে অস্তিত্বহীনতার মুখোমুখি হতে হয় দেশ-বিভক্ত দুই বাংলার অধিবাসীদের। এমনই চেতনার আলোকে রচিত *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) উপন্যাস; যেখানে আলোচিত হয়েছে একটি বাঙালি মুসলমান পরিবারের চার প্রজন্মের জাতিগত পরিচয় অন্বেষণের ইতিহাস। রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের সংকটের চিত্রও এতে বিদ্যমান। একটি মুসলিম পরিবারের চার প্রজন্মের ভাবনা ও জীবনদর্শন এসেছে রাজনীতির আলোকে। উপন্যাসের শতবর্ষব্যাপী কাহিনি-কাঠামোতে মূর্ত হয়েছে বাঙালির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস ও আত্মজিজ্ঞাসার কথা। এর মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে অতীতের হৃত সত্য, বর্তমানের প্রকৃত মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের ইতিবাচক আভাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, কোম্পানি আমল ও নব্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে বাঙালির অতীতকালের স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিতনির্ভর এ উপন্যাস:

> সমাজ, রাজনীতি ও জীবন ধারায় ভাঙচুর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয় এবং এই ধারাতেই ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নিজেকে আবিষ্কার করে। এই উপন্যাসে চারটি প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনের ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে একটি আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে নির্মিত হয়েছে। (রূপদত্তা ২০১৬: ২৫০-২৫১)

এ উপন্যাসকে অনেকেই শওকত আলীর আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলার চেষ্টা করেছেন। আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলার কয়েকটা কারণ রয়েছে; যেমন, এ উপন্যাসের কাহিনি কাঠামো ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে লেখকের জীবনদর্শনের সাদৃশ্য। অবশ্য এ দিকটা আমাদের বিষয়ানুগ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে না হলেও এ কথা বলা অসমীচীন নয় যে, এর মধ্যে অন্তর্লীন আছে লেখকের বাঙালি সত্তার প্রতি গভীর আবেগ ও অনুরাগ। উপন্যাসে যে প্রধান পরিবারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে জালাল প্রধান ওই পরিবারের আদিপুরুষ। জালাল প্রধান কর্তৃক ১৭৬০ সালে সংঘটিত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে; যাতে লেখকের চেতনায় বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাসে একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিচয়। ভারতবর্ষের বাঙালি তাদের লোকধর্ম, লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার প্রচলিত সমাজধর্মের বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যেও হাজার হাজার বছর ধরে পালন করে আসছে, যা তাদের নিকট ঐতিহ্যপ্রীতির চিরায়ত নিদর্শন। বাঙালি সমাজের এসব ঐতিহ্যনির্ভর লোকাচার এ উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হিন্দু-মুসলমানের

প্রচলিত কোনো ধর্মীয় পালনসর্বস্ব আচার নয়। এগুলো বাঙালির লোকায়ত ও নিজস্ব আচার। শওকত আলীর বঙ্গবাসীর এসব লোকধর্মের উল্লেখ প্রমাণ করে লেখকের বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ।

এ আখ্যানে কিছু লৌকিক আচারধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে; যা পুরোপুরি ইসলামি নয়, আবার সম্পূর্ণরূপে হিন্দুয়ানিও নয়। এটাকে বলা যায় বাঙালির একান্ত নিজস্ব আচারধর্ম। যেমন: অবিবাহিত কিশোরী কন্যা লালশাড়ি পরে হাতের ডালায় ধানের শীষ ও দূর্বা ঘাস নিয়ে বীজের সম্ভাবনায় সবুজ মাঠের সূর্যাস্তের আভায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনাগত শস্যকে আহ্বান করে। আবার পুরাতন ইটের দ্বারা নির্মিত একটি ছোটো ঘরে বছরে একদিন নামাজ পড়ার পরে শিরনি দেওয়ার রীতি ছিল। শীতের রাতে কুহুসীর জন্য পোলাও, কালো মোরগের মাথা, ক্ষীর আর প্রদীপ জ্বালিয়ে কলাগাছের ভেলায় সাজিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। দেশভাগের পর নতুন মালিক এই ঘরটিকে মন্দিরে পরিণত করে। সেখানে মহরমের তাজিয়ার জন্য বসানো বেদীর নিচে মানতের জন্যে টাকা পয়সা, মোরগ-কবুতর ও ছাগল-ভেড়া প্রদান করা হতো। রায়হানের স্মৃতিতে এমন লোকাচারের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে:

> মেজো ফুফুর মেয়ে জোবেদা বুবুকে ডেকে আনা হত ঐ সময়। লাল শাড়িখানি পরিয়ে হাতে একটি ডালা নিয়ে তার পেছনে পেছনে বাড়ি থেকে বেরুত সবাই। সন্ধ্যার আগে দুই আলের কোণায় রাখা হত ডালাটা। তারপর ডালার চারদিক চেরাগ জ্বালিয়ে দেওয়া হত, ডালায় থাকত ধানের শীষ এবং দূর্বা। সূর্যাস্তের লাল দিগন্তের দিকে মুখ করে ডালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাকত জোবেদা বুবু, আয় আয়-ভুলাভুলির আলো দেখ। কার উদ্দেশ্যে আলো দেখানো হত, কাকে ডাকা হত, এখনও জানে না রায়হান। (শওকত ২০১৭: ৮৬)

এখানে দেশভাগের পটভূমিতে স্মৃতিচারণায় বাঙালির চিরায়ত লোকধর্ম ও বিশ্বাসের উল্লেখ করা হয়েছে; যার মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করা হয়েছে।

প্রধান পরিবারের জামাতা জওহর আলী শ্যালকের মৃত্যুর পর শ্যালক-স্ত্রী সমিরুন্নেসাকে দ্বিতীয় পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে। বুদ্ধিমান-দূরদর্শী জওহর মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার কথা ভেবে নিজের সন্তান মুর্শেদকে উচ্চশিক্ষায় দীক্ষিত করে। সে অনুভব করে বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুর চেয়ে উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে। সে দেখে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সমাজেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনকে সে গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করে এবং পুত্র মুর্শেদ আলীকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়। তবে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মুর্শেদের উপনিষদনির্ভর জ্ঞান অন্বেষণের দিকে ঝোঁক। সে স্বদেশের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তাঁর বন্ধু বিভুরঞ্জন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ও নিজের পত্নী সালমা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্ত্রী সালমার রাজনৈতিক দর্শনে পরিবর্তন ঘটে। দেশভাগের এক বছরের মধ্যে সালমার মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিত্বের উপলব্ধি জাগ্রত হয়। মুর্শেদের চেতনায় বাঙালিত্ব, সালমার মধ্যে বাঙালি মুসলমানের স্বার্থ; অন্যদিকে বিভুর মধ্যে বাঙালির শ্রেণিদ্বন্দ্ব মুখ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে এসেছে মুর্শেদের মেজো ছেলে রায়হানের পরিবারের নানা সংকট ও অপ্রাপ্তির কথা। এ উপন্যাসে দেশভাগের পূর্ব থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ও সমাজের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

শওকত আলীর উপন্যাসের চরিত্র কমবেশি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় সমাজের মানুষের জন্য সাম্যনীতির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। দেশভাগের পর তিনি অবলোকন করেছিলেন সমকালীন সমাজের চিত্র ও মানুষের রাজনৈতিক জীবনভাবনা। দেশভাগের পরে বিশেষ করে এ দেশের বাঙালি এবং দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া ওপার বাংলার বাঙালি নবচেতনা নিয়ে দেশগড়ার স্বপ্নে নিয়োজিত থাকে। তারা কেউ কেউ সফল হলেও অনেকের মধ্যে ব্যর্থতার বেদনা লক্ষ করা যায়। *ওয়ারিশ* উপন্যাসে যেমন বাঙালি মুসলমান সমকালীন শিক্ষা ও রাজনীতিকে জীবনের প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে, তেমন চিত্রই দেখা যায় *বসত* উপন্যাসে। এ উপন্যাসের চরিত্র রায়হান, যে বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এ রাজনীতিতে আসার পেছনে কাজ করেছে তার স্বীয় চেতনা, এবং বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা মিঠু। মিঠুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে রায়হান প্রগতিশীল ছাত্র-আন্দোলনে জড়িয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল মতিনের বক্তৃতায়ও সে রোমাঞ্চিত হয়। ছোটো ভাই শান্তর মৃত্যু তার জীবনে নতুন রেখাপাত করে।

এখানে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি মনীষা চক্রবর্তীর ছোটো বোন মুকুলের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে মূলত উঠে এসেছে কারাগারের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত ও কাহিনি। বন্দিদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স হেনার। কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল ছিল। হেনা রায়হান ইতিহাস-ভূগোল-দর্শন-সাহিত্য বিষয়ে তর্ক করে। সে পরিবেশ ও গাছপালাকে ভালোবাসতে শুরু করল। উদ্দেশ্য রাজনীতি নয়, সাধারণ মানুষের পাশে থাকা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। দেশের জন্য আন্দোলন করে সে রাজবন্দি হয়। দিনাজপুর কারাগারে তাকে বন্দি করে রাখা হয়। অনেক রাজবন্দি দেশ পরিচালনার জন্য ধর্মকে বড়ো করে দেখতে চায় না। যে রাষ্ট্র মানুষের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নিতে চায়, সে রাষ্ট্রে থাকার কোনো যুক্তি নেই। হেনা তখন নিজেকে আগন্তুক মনে করে। রাজনৈতিক আদর্শ হেনার বড়ো ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। রায়হানকে পুলিশে ধরার পর ফিরে আসে তার চৈতন্য এবং কারাভোগের পরে তার চেতনায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে নতুন দেশের মানুষের সঙ্গে মেশে এবং তাদের জন্য জীবনে কিছু করার ব্রত নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। ভারত থেকে দেশভাগের শিকার হয়ে এ দেশে এসে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এ দেশের আলো-মাটির সাথে নিজের প্রত্ন-বাঙালি সত্তাকে পুনরায় আবার অনুসন্ধান করবার সাধনায় মগ্ন হয়। নতুন দেশে বসত স্থাপনের এ প্রচেষ্টার মধ্যে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন নিহিত। এটা ছিল তাদের নতুন বসত স্থাপনের স্বপ্নের বিস্তার। জেল থেকে মুক্তির পরে রায়হানের উপলব্ধিতে নিজের প্রকৃত পরিচয় ও অবস্থান উঠে আসে এভাবে:

> নিজেকে এখন খুব হাল্কা লাগে। জেলখানার নিঃসঙ্গতার বোঝাটা যেন মনের ওপর আর নেই। সে এখন নিঃসঙ্গ আর একাকী নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। কমরেডরা বহুদূরে, তবু মনে হয়, তারা কাছাকাছি আছে। সিনিয়র কমরেডদের কথা মনে পড়ে, হাজী স্যার কারিদবরণ, সুনীল রায়। তাদের গলার স্বরও যেন শুনতে পায়। (শওকত ২০১৭: ২১৬)

নতুন দেশে নতুনভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে রায়হানের ভেতরকার সত্তা জেগে উঠেছে। বাইরের জগতে সে দেশভাগের কারণে অন্য দেশে আসতে বাধ্য হয়েছে। তবে তার মধ্যে

থাকা বাঙালিত্বের শক্তি, সাহস ও অদম্য বিশ্বাসের সমন্বয়ে সে গড়তে চায় এই দেশকে, কাজ করতে চায় মহানব্রত নিয়ে দেশের মানুষের জন্য।

৫

১৯৪৭ সালের 'বাংলাভাগ' বাঙালির জীবনে বয়ে এনেছে বিপন্ন পরিস্থিতি। দেশভাগের পেছনের রাজনীতিকে 'আধিপত্যকামিতা' বলা চলে, কারণ যারা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ চরিতার্থ করার নিমিত্তে কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে যে ভারতবর্ষ ভাগ করেছে, তাদের মগ্ন-চৈতন্যে যে 'আধিপত্যকামিতা'র আদিম-ইচ্ছা সক্রিয় ছিল, তা বলা অসঙ্গত হবে না। দীর্ঘদিন ধরে যে বাঙালি তাদের হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আগলে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের সেই আজন্ম লালিত আবাসভূমি ও ঐতিহ্যধর্মের পরিচয়ে ভাঙন ধরে। বাঙালি জনজাতির ওপর অন্য জাতির আধিপত্যের আছে করুণ ইতিহাস। তবে এর পেছনে যে শক্তি অধিক সক্রিয় থাকে তার স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> প্রতিনির্ণয় করা মানুষের সাধারণ প্রবণতা। মানবসম্পর্কের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষত সমাজ-ধর্ম, রাজনীতি-অর্থনীতি, শ্রেণিবর্গ এই প্রতিনির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক ক্ষমতা একসময় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে এবং দুটির মেলবন্ধনে সমাজের কর্তৃত্ববান একাংশ দুর্বল অংশটিকে সমাজে বা ইতিহাসে নাজেহাল করতে পারে দীর্ঘকাল। (সিরাজ ২০২২: ২১)

বাঙালিদের পরিচয় ঘটে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করা হয় পাকিস্তান এবং হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান (ভারত)। এই বিভাজননীতিতে অখণ্ড বঙ্গদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নতুন পরিচয় ঘটে উন্মুল ও শরণার্থী হিসেবে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ভারতের মুসলমান নিজেদের স্বদেশ ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আসে, অন্যদিকে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরও চলে যেতে হয় ভারতে। কিন্তু তারা নতুন দেশে অভিগমন করলেও তাদের স্মৃতিতে রয়ে যায় পূর্বের স্বদেশের প্রতি মায়া ও ভালোবাসা। তারা ভুলতে পারে না দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সামাজিক ও মানবীয় সম্পর্ক। এমনই চেতনায় শওকত আলীর বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ এসেছে *স্ববাসে প্রবাসে* (২০০১) উপন্যাসে। এ উপন্যাসে রোম্যান্টিক ভাবাবেগ থাকলেও লেখকের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন দর্শন প্রচারের। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এক গভীরতর ইতিবাচক স্বদেশপ্রীতির অনুষঙ্গ। তাঁর পূর্বসূরীদের দেশভাগের সময় না-পারা ইচ্ছাশক্তিকে উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্বয়নে তুলে এনেছেন উত্তরপ্রজন্মের ভাবনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মানস দত্ত ও জামিল আহমেদের স্মৃতিচারণ, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অরুন্ধতী-আফসানের প্রণয়ের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও রাজনীতির স্বরূপে বাঙালির স্বীয় পরিচয় অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে মানস দত্তের সঙ্গে জামিলের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলের কথা জানানো হয়েছে এভাবে:

> এখানে আমার বাবার দেহ মাটির সঙ্গে মিশে আছে, ছোটো ভাই প্রাণ দিয়েছে এ দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য। ছোটোবোনের সম্ভ্রম লুট হয়ে গেলে সে আত্মহত্যা করে করে এ মাটিতেই দেহ বিছিয়ে দিয়েছে—শুধু ঠাঁই গাড়া নয় মানু। এখানকার মাটির নিচে আমাদের জীবনের মূল শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। (শওকত ২০১৮: ১৫৭)

এ উপন্যাসে দেশভাগের শিকার হয়ে জামিল আহমেদরা পূর্ববাংলায় চলে আসে; কিন্তু মানস দত্তরা প্রথম দিকে দেশত্যাগ করেনি। কলেজে পড়ার সময় তাদের দুইজনের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মানস দত্তের দেশত্যাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে অনীতার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কের। অনীতা ভারতে গেলেও পূর্বের ভালোবাসার মানুষকে না পেয়ে মিশনারিতে যোগ দেয়। দেশভাগের কারণে এভাবে মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেদ পড়েছে; এগুলোও উপন্যাসে উপস্থাপিত। পরিবারের সবাই পূর্ববাংলা ছেড়ে ভারতে গেলেও মানস দত্তের বড়ো দাদা তাপস দত্ত দেশ ছেড়ে যায়নি। তার দেশ না ছাড়ার পেছনে কাজ করেছে নিজের দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বাঙালি সত্তার প্রতি অটল-অবিচল আস্থা। সে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। অকৃতদার তাপসের চেতনায় সুপ্ত ছিল স্ববাস ছেড়ে অন্যত্র না যাওয়ার। অন্য দেশে যাওয়া তার নিকট প্রবাসে যাওয়ার মতোই বোঝায়। লেখক তাপস দত্তের মধ্যে যেন প্রকৃত বাঙালির হার না-মানা সত্তাকে খুঁজে পেয়েছেন। লেখকের বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ইতিবাচকতা এ উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাপস দত্তের আত্মপরিচয়কে টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে।

তাপস দত্ত স্ববাসকে কখনো পরবাস করতে রাজি নয়। সে মনে করেছে পরিণতি যাই হোক না কেন, নিজের আত্মপরিচয়কে সে বিকিয়ে দেবে না। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঔপন্যাসিকের ধর্ম ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবীয় সম্পর্ককে মুখ্য করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অরুন্ধতী ও আফসানের সম্পর্কের মধ্যেও রয়েছে সে চেতনা। দেশভাগের রাজনীতিতে হয়তো ধর্ম জিতে গিয়ে একসময় জামিল আহমেদ ও মানস দত্তের আবাসভূমি প্রবাসে পরিণত হয়েছে, তবে তাদের উত্তরপ্রজন্ম পেয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করার নীতি। বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ধর্ম কখনো বড়ো হয়ে ওঠেনি, বড়ো হয়ে উঠেছে মানবীয় সম্পর্ক; যা স্পষ্ট হয়েছে আফসান-অরুন্ধতীর সম্পর্কের মধ্যে। রাজনীতি ও ধর্মের কারণে যেসব বাঙালি নিজের দেশ ছেড়ে পরদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জীবনের বেদনাময় স্মৃতির মধ্যে লেখক উপলব্ধি করেছেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট।

দেশভাগের পরে ধর্মের আড়ালে এক শ্রেণির মানুষের নিকট বড়ো হয়ে ওঠে 'মাইনরিটি' নামক অভিধা। এই 'মাইনরিটি' ভারত-পাকিস্তানের জনমানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানুষের জন্মসত্তা, ব্যক্তিগত পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক পরিচয় ও জন্মভূমি ইত্যাদি পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায়। যারা ১৯৪৭ সালের পূর্বে ধর্মের পরিচয়ে নয়, বাঙালি জাতির পরিচয়ে পরিচিত হতো, তারা ক্রমেই অস্তিত্বের জন্য নিজের দেশ ছেড়ে বসতের জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। *বসত* (২০০৫) উপন্যাসে রয়েছে এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ; যেখানে ধর্মের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে বাঙালির সত্যিকার পরিচয় অন্বেষণ করার। এ উপন্যাসে মনিরা, তার ভাইবোনদের নিয়ে দিনাজপুর শহরে বাড়ি ভাড়া নেয়। তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে ব্যক্তিজীবনের স্বপ্ন, নিতে হয়েছে অভিভাবকের দায়িত্ব। তাদের বাবাও কিছুদিন পরে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় প্রাণরক্ষার জন্য। মনিরা মা-হারা ছেলে শান্তর লাশ দেখতে পেয়েছে। শান্তকে কবর দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের মাটিতে। তাদের মনে একটা বড়ো সংশয় ছিল, কীভাবে তারা পাকিস্তানে আসবে। কিন্তু পাকিস্তানে আসার পরে তাদের তেমন বড়ো কোনো সমস্যা হয়নি। লেখাপড়া জানার কারণে মনিরা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। তারা

যে বাসায় আশ্রয় নেয়, সেই বাসাটি অনেক ছোটো। তবে দ্রুত চাকরি পওয়াতে মনিরা কিছুটা স্বস্তি পায়। হেনা বন্ধুদের সাহায্যে নতুন বাড়ি পায় এবং বাড়িটি কিনে সেখানে বসত গড়ে তোলে। এদিকে মনিরা-রায়হানদের পরিবারের সঙ্গে হেড-মিস্ট্রেস মনীষা চক্রবর্তীর ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে লেখক ওই দেশভাগের সময়ে মুসলমান পরিবারের সঙ্গে হিন্দু পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নানা সংগ্রামের পরে মনিরার পরিবার কিছুটা হলেও আত্মপরিচয়ে পরিচিত হতে পেরেছে। তবে তাদের বাবার আসা ও পুনরায় বিয়ে করা সেই আত্মপরিচয়ে অস্বস্তি, অশান্তি ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

৬

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসী দেশভাগের সময় হারাতে বাধ্য হয়েছে নিজেদের দীর্ঘ দিনের পরিচয়। ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে যে দেশ ভাগ হয়েছে, তাতে এই দুই অংশের মানুষের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা কাজ করেছে। তাদের চেতনায় বারবার সক্রিয় থেকেছে হারানো পরিচয় অন্বেষণের চেষ্টা। পুনরায় তারা সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহসী উদ্যোগ নিলেও পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনায় তা কখনো কখনো ব্যর্থতায় রূপ নিয়েছে। এমনই চেতনা এসেছে *উত্তরের খেপ* উপন্যাসে। 'বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রক্তিম ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে *উত্তরের খেপ* বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য এক সংযোজন' (চঞ্চল ২০১৫: ১১৫)।

সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তিন পুরুষের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। দেশভাগ ট্রাকচালক হায়দারের মতো অসংখ্য মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলেছে। এ কারণে তার বাবা সবদর আলী ও মা নিশাত বানুর জীবনে কোনো স্বস্তি আসে না। দেশভাগ তার মায়ের জীবনকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করেছে। শুধু তার মায়ের জীবনে যে বিষাদ নেমে এসেছে তাই নয়, তার নানা মাজহার খানও অসহায় হয়ে নিজের বাড়িঘর ও কাপড়ের দোকান অল্প টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের স্বভূমির প্রতি তার এতটাই গভীর মায়া ছিল, যা তার গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য জীবনের একটা পর্যায়ে মানুষের সচেতন সত্তা পরাজিত হয়। উপন্যাসে মাজহার খানের বেলায়ও তাই ঘটেছে। স্ত্রী দরমিয়া বিবি ও দুই মেয়ে ইরশাদ বানু ও নিশাত বানুকে নিয়ে অবশেষে গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় সে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তানে যেতে। তার এই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলে আসার মধ্যে এক ধরনের গভীর মনোবেদনা বর্তমান। যখন সে খুবই অল্প টাকায় নিজের সহায়-সম্বল বিক্রি করে, তখনই তার মনোগভীরে নিজের প্রকৃত পরিচয় অন্বেষণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মাজহার খানের আত্মপরিচয় অন্বেষণের দিকটি এভাবে স্পষ্ট হয়েছে:

> কোমরে মাত্র দশ হাজার টাকা। তার অতীত বর্তমান সবই। জীবন ধারণের যাবতীয় উপায়ের দাম মাত্রই ঐ দশ হাজার টাকা—ব্যস এবার তুমি বিদায় হও—এখন আর তুমি কেউ নও আসানসোলের। (শওকত ২০১৮: ৩৬)

এখানেই বাঙালি হিসেবে তার নিজস্ব পরিচয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। জীবনের এই ভাঙা-গড়া উপমহাদেশে বসবাসরত প্রকৃত বাঙালি বাসিন্দার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে

ফেলেছে। দৃশ্যমানভাবে নতুন দেশে তাদের একটি আলাদা পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তুকেন্দ্রিক জীবনের ঐতিহাসিক নিদর্শন।

নতুন দেশে মাজহার খানের ব্যবসা পরিচালনা ব্যর্থতায় রূপ নেয়। তার আকস্মিক মৃত্যু, নিশাত বানুর মামার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া, মামির দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে নিশাত বানুর ব্যক্তিজীবনে এক প্রকার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তার ব্যক্তি পর্যায়ের এই প্রভাব চেতনমনে সক্রিয় হয় এবং সেটি তার দাম্পত্য জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এখানে গভীরভাবে লক্ষ করলে উপলব্ধি করা যায়, দেশভাগের কারণে নারীর নিজের পরিচয় ও ব্যক্তিত্ববোধ বৃহৎ পরিসরে দৃশ্যমানভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি মায়ের দ্বিতীয় বিয়েও তাদের সন্তান ট্রাকচালক সবদর আলীর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। মায়ের বিয়েকেন্দ্রিক জীবনযাপন পদ্ধতিও হায়দারের জীবনকে করেছে উদাসীন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে হায়দারের বাবাকে আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করে। বাবা-সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে, 'সবদরের জীবনের ট্রাজেডির মূলে বিভাগোত্তর কালের জাতিগত বিভেদ এবং হায়দারের জীবনের ট্রাজেডির মূলে আছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ' (শাফিক ২০১৪: ১৬৭)। মায়ের অনুরোধে হায়দারের পালিয়ে যাওয়া, নিজের চোখের সামনে বাবার নির্মম হত্যা, মাকে প্রথম স্বামী কর্তৃক জোরপূর্বক অপহরণ তার মনোলোকে এক ধরনের সংকটের আবহ তৈরি হয় যা তার ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনকে শৃঙ্খলাহীন করে। হায়দারের জীবনের মতো ১৯৪৭ সালের দেশভাগকেন্দ্রিক সৃষ্ট দাঙ্গা, সামাজিক দ্বন্দ্ব, ধর্মকেন্দ্রিক বিভেদ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় কঠোরতা, মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিক অপরাপর বাঙালির জীবনেও প্রভাব ফেলে। এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, সবদর আলী, নিশাত বানু ও হায়দারের জীবনের পরাজয় ও উন্নাসিকতার পেছনে দেশভাগ মূল ভূমিকা পালন করেছে। নিজের নতুন পরিচয়কে নবরূপ প্রদানের জন্য হায়দার ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে জয়লাভ তাকে নতুন এক প্রাপ্তির আনন্দে অবগাহন করায়, তবে তার ব্যক্তিজীবনের যুদ্ধ শেষ হয় না। বাবা-মায়ের মৃত্যু তার চৈতন্যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, অনুভূতিদেশে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানে। বিশেষ করে মায়ের অনুপস্থিতি তার নিজের আত্মপরিচয় উন্মোচনে করুণাশ্রিত অনুভবের সৃষ্টি করে:

> না, মা নেই। দিনাজপুরে না, পার্বতীপুরে না, সৈয়দপুরে না, রংপুর না। কোথাও মাকে খুঁজে পায়নি হায়দার। মায়ের মুখ পুরো স্মরণে আসে না। শুধু একটা চিৎকার মনের মধ্যে শুনতে পায় সে অহরহ—ও মেরে লাল তু ভাগ যা, আপনা যান বাঁচা। (শওকত ২০১৮: ১১৭)

অবশ্য হায়দারের শৈশব-কৈশোরের দুঃসহ স্মৃতি, বেদনাক্রান্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা, সংকটাপন্ন ও অসম দাম্পত্য-সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবনের হতাশা প্রভৃতি দেশভাগের কারণেই সৃষ্ট। স্ত্রী, সন্তান, পরিবার সকল বিষয় থেকে হায়দারের পলায়ন মানসিকতা প্রমাণ করে যে, সে নিজের বর্তমান পরিচয়ে সন্তুষ্ট নয়। তার চেতনায় প্রবাহিত হতে থাকে বাঙালি জাতির ঐতিহ্যগত লুপ্ত স্মৃতির কথা। মগ্ন-চৈতন্যে ভেসে ওঠে সেই পরিচয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বাংলা সাহিত্যে শওকত আলী যেমন নিজের পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি ছেড়েছেন, বাঙালি হিসেবে পথ চলতে গিয়ে নতুন পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করেছেন, তেমনই সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ লেখকও এমন সংকটে পড়েছেন। তাঁদের রচনায়ও দেশভাগকেন্দ্রিক বাঙালি জাতির পরিচয় অন্বেষণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসে হায়দারের পরিবারকেন্দ্রিক উদাসীনতার পেছনে বা গভীরে লুকিয়ে আছে বিবিধ কার্য-কারণ সূত্র। তবে স্ত্রী, সন্তান ও সংসারের প্রতি এমন উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার মূলে বিদ্যমান রয়েছে তার আত্মপরিচয়ের সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ। অবশ্য হায়দারের উক্তিতেই সে মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে:

> আমি আবার আসব, তুমি ভালো থেকো, মানুষের জীবন এমনই—কখনো খুঁজে পাওয়া যায়, কখনো যায় না। হায়দার তারপর গেট দিয়ে বের হয়ে রাস্তায় নামে। তারপর জনস্রোতের অনুকূলে হাঁটতে থাকে। স্রোত যেহেতু দক্ষিণে যায়, গন্তব্য তার দক্ষিণেই। (শওকত ২০১৮: ২৪০)

হায়দারের উক্তিতে এ কথা স্পষ্ট যে, সে পুনরায় ফিরে আসতে চায়। অবশ্য তার এই ফিরে আসার আশাবাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর বেদনা, না-পাওয়ার হতাশা ও নিজের বাঙালি পরিচয় পুনরায় ফেরত পাওয়ার অতল আবেগ। তার চেতনার অন্তরালে জীবন সম্পর্কিত দার্শনিকতা বিদ্যমান, যা হাজার বছরের বাঙালির জীবন ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে। নতুন পরিবেশে হায়দারের জনস্রোতের মাঝে হারিয়ে যাবার অর্থই হলো নিজেকে খুঁজে ফেরার সাধনা।

হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মের ভিত্তিতে ভিন্নভাবে একটা পরচয় নির্দেশিত হয়। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক একক হলো তারা উভয়ই জাতি হিসেবে বাঙালি। ধর্ম হলো মানুষের এক ধরনের বিশ্বাস। সম্প্রদায় হলো মানুষের জীবনের যূথবদ্ধ পরিচয়। এই পরিচয় তাদের পারিবারিক-সামাজিক জীবনে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে নতুন প্রভাবক হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মীয় পরিচয় যদি সামাজিক সম্পর্কের বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহলে জাতিসত্তাগত সংকটের সৃষ্টি করে, এমনই দর্শনের ছায়াপাত লক্ষিত হয়েছে *স্ববাসে প্রবাসে* (২০০১) উপন্যাসে।

উপন্যাসে জামিল আহমেদের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ঔপন্যাসিক এখানে জামিল আহমেদ ও মানস দত্তকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির জাতিসত্তাগত পরিচয়ের অনুসন্ধান করেছেন। রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে জামিল আহমেদকে পূর্ব-পাকিস্তানে এবং মানস দত্তকে ভারতে চলে যেতে হয়। অনেকের মতে এইভাবে চিহ্নায়ন জাতিগত সত্তার ক্রমাবনতির মূল কারণ। হিন্দু-মুসলমানগণ সম্পর্কে যে মত প্রচলিত আছে তা হলো:

> বর্ণ, বর্ণেতর ও অস্পৃশ্য বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে রক্তবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। বাঙালী মুসলমানেরা যে বাঙালী হিন্দুদেরই সমগোত্রীয় ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ। (নীহাররঞ্জন ১৪২৫: ৭৩)

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্বেষণের নিমিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নিম্নশ্রেণির বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্তের সাথে বাঙালি মুসলমানের উৎসগত বিচারে রক্তের মিল রয়েছে। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ই সমগোত্রীয়। সুতরাং উপন্যাসে জামিলের সঙ্গে মানস দত্তের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাদের সন্তানদের প্রণয়ের

সম্পর্ক স্বাভাবিক। কারণ তারা জাতিগতভাবে বাঙালি। কিন্তু সমাজে তাদের বাঙালির জাতিগত পরিচয়কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। আর এ কারণেই বাঙালির সত্তাগত পরিচয় হুমকির মুখে পড়েছে। উপন্যাসের প্রথম ভাগে জামিল আহমেদ ও মানস দত্ত দুই বন্ধুর স্মৃতিচারণ এবং দ্বিতীয় ভাগে অরুন্ধতী ও আফসানের মধ্যকার প্রেমকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালির পরিচয়গত সংকট। স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি ও ধর্মীয় ভেদাভেদ নীতি তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে শেষ পর্যন্ত সফলতায় রূপ দিতে দেয়নি। পূর্বের আত্মপরিচয়কে পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য মানস দত্ত তার মেয়ে অরুন্ধতীকে নিয়ে আসে পূর্ব-পাকিস্তানে। বন্ধু জামিল আহমেদের ছেলে আফসানের সাথে পরিচয় হয় অরুন্ধতীর। মানস দত্ত ও জামিল আহমেদ তাদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়। এজন্য নিজেদেরকে সান্ত্বনার জন্য তাদের উত্তরপ্রজন্ম আফসান ও অরুন্ধতীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালায়। আফসান ও অরুন্ধতীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলে অরুন্ধতীর মা হরিমতি কর্তৃক তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। হরিমতির মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এর প্রধান কারণ। তার ধারণা, পূর্বে মুসলমানরা তাদের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন সৃষ্টি করেছে—সেই সম্পর্কের ভাঙন জোড়া লাগানোর দায়িত্ব হরিমতি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অরুন্ধতী-আফসানের পূর্বপুরুষেরা ধর্মের বেড়াজালে আটকে পড়ে নিজেদের স্বদেশকে পরবাসী করে তুলেছে। স্বাভাবিক সম্পর্ক হয়েছে অস্বাভাবিক। ধর্ম তাদের মধ্যে প্রাচীর তুলেছে। তাদের দুইজনের পরিপূর্ণ মিলন সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অরুন্ধতী তার বাবার সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে। এভাবে তারা উভয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটে নিমর্জিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক থেকেছে; যেখানে ধর্মীয় পরিচয় তাদের বাঙালি পরিচয়ের আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

৭

সাধারণভাবে জাতি বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কে বোঝায় যাদের একটি নির্দিষ্ট নিজস্ব ভাষা, স্বতন্ত্র ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত ভৌগোলিক পরিকাঠামো থাকবে। এই জাতি একদিনে গঠিত হয় না। এর পেছনে বিদ্যমান থাকে দীর্ঘ দিনের একটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ইতিবৃত্ত। জাতি একটি রাজনৈতিক আর্কিটাইপ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, জাতি গঠনে নৃতাত্ত্বিক উপাদান এর ভিত্তিমূল প্রস্তুত করে এবং রাজনৈতিক দর্শন তার অস্তিত্ব প্রকাশ ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর পরিক্রমা ক্রিয়াশীল থাকে এবং তা বিকাশের সর্বোত্তম পর্যায়ে রাজনৈতিক দর্শন মিশ্রিত হয়ে জাতিরাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। 'ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত এক বিশেষ ধরনের ঐক্যবোধসম্পন্ন জনসমষ্টিকেই বলা হয় জাতি' (আবুল কাসেম ২০২৩: ৭২)। বাংলা অঞ্চলের বঙ্গজনরাও দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পরিচিতি পায় একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে। এই ঐতিহাসিক নবপরিচয়ের নাম বাঙালি জাতি। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবেই জাতি হিসেবে বাঙালি সংগ্রামশীল। তারা প্রাক্-আর্য থেকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সদা সংগ্রামরত। প্রতিটা ঐতিহাসিক যুগে তারা বাধ্য হয়েছে তাদের স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হতে। আর্যদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ভারতবর্ষের বৃহৎ সাংস্কৃতিক-বঙ্গের অনার্যদের ওপর এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা অনেক সময় নিজেদের পরিচয় প্রদানেও ছিল পরাধীন। কতিপয় জনজাতি আর্যদের আগ্রাসন মেনে নিয়ে জীবন-

জীবিকা নির্বাহ করেছে, আবার কেউ কেউ ধর্মান্তিত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে বেঁচে থাকার তাগিদে। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ ভূমিতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রত্ন-বাঙালির ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই এসব বিষয় প্রথমেই নজরে আসে। এই বাঙালি নিজেদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিয়ত সংগ্রামরত; যা তাদের চেতনমনে ক্রিয়াশীল। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় বাঙালিকে পূর্বের ন্যায় নিজেদের স্বভূমি পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এর প্রধান কারণগুলোর অন্যতম হলো, যারা এ সময় এভাবে নিজেদের পরিচয়ের জন্য লড়াই করেছে, তারা তো ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেনি। যারা ক্ষমতা-কাঠামোর প্রান্তে অবস্থান করে, তাদেরই বারবার এমন দেশত্যাগের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এ যেন বাঙালির হাজার বছরের দীর্ঘ পথচলার ঐতিহাসিক পরিক্রমা। এই বাস্তবতায় যারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরকে নির্মম অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে কেউ কেউ বাঙালি জাতির গুণ ও দুর্বলতা উভয় দিকের কথা বলেছেন। যেমন:

> আত্মকেন্দ্রিকতা বাঙালি মানসের যেমন একটি গুণ, তেমনি দুর্বলতার দিকও বটে। স্মরণ রাখা দরকার আত্মকেন্দ্রিক জীবনমুখিতাকে সুসংহত ঐক্যরূপ না দিতে পারলে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় পর্যবসিত হয়। (সৈয়দ আকরম ২০২৩: ৪৫)

বাঙালি জাতির এই যে আত্মকেন্দ্রিক মানস-প্রবণতা গড়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, এখানকার বাঙালি জনের জীবনমুখী আত্মকেন্দ্রিকতা জীবনবিমুখ বৈরাগ্যে রূপান্তরিত করেছে। ফলে বহিরাগত বিভিন্ন শক্তি বারবার আক্রমণের মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ কারণে বাঙালির ওই জীবনমুখী আত্মকেন্দ্রিকতা জাতীয় ঐক্যে রূপ না নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা বাঙালিজনের একটি বিশেষ দুর্বলতা বলে মনে করা হয়।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার কারণে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে ভারতবর্ষের অর্জিত স্বাধীনতার মর্যাদা কার্যত রক্ষিত হয়নি। অবশ্য দেশভাগের অনেক আগে থেকেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, যা মাঝে মাঝে রূপ নিয়েছে ভয়াবহ দাঙ্গায়। এই দেশভাগের গভীরে গ্রোথিত ছিল রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক প্রয়োজন, যেখানে সাধারণ বাঙালিদের জীবনে দৃশ্যমান কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বরং বাঙালি জাতির ওপর নেমে এসেছে অসহনীয় সংকট ও নির্মম দুর্দশা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ দুই ধর্মের বাঙালির জীবনে উদ্বাস্তু নামক কলঙ্কের সাথে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। যারা হাজার হাজার বছর ধরে একসাথে মিলেমিশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে, তারা ভৌগোলিক বিভাজন রেখার কারণে পরস্পরবিরুদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়, যা বাঙালির সত্তাগত পরিচয়কে হুমকির মধ্যে ফেলেছে। এই দুই পারের বাংলার মানুষের মধ্যে বা বাঙালিদের মধ্যে যেমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভেদ বেড়ে যায়, তেমনি ভাষাগত পার্থক্যও প্রধান হয়ে ওঠে। *বসত* উপন্যাসের অন্তর্বয়নে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের সংকট উঠে এসেছে। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের দেশত্যাগ করে পূর্ববাংলায় চলে আসার প্রসঙ্গও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় চিকিৎসক মুর্শেদ আলী তাঁর পরিবারকে পূর্ববাংলায় রাতের অন্ধকারে পাঠিয়ে দেয় তীব্র

আশঙ্কায় ও নিরাপত্তাহীনতায়। সে নিজে কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রবলভাবে বিশ্বাসী থাকলেও কখনোই দেশভাগের পক্ষে ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার এ চেতনার পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে তার স্ত্রী মুসলিম লীগের রাজনীতির মতাদর্শে বিশ্বাসী। স্বামী-স্ত্রী দুই জনের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ থাকলেও দেশভাগের মতো পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার মানসিকতা তাদের ছিল না। অবশ্য সন্তানদের পাঠিয়ে দেওয়ার পরে সেও পূর্ববাংলায় আগমন করে এবং পুনরায় বিয়ে করে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ব্যক্তিজীবনে তার চেতনার পরাজয় ঘটেছে, তবে তা স্থায়ী রূপ পায়নি। সন্তান হেনা রায়হানের মধ্য দিয়ে তার নতুন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হেনা রায়হানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নতুন দেশের জনগণের জন্য কাজ করার ইচ্ছা তার সেই নবচেতনার নিদর্শন। সন্তানের দেশপ্রেমমূলক কর্মপ্রয়াসের মাঝে সে উপলব্ধি করে বাঙালিত্ব চেতনা।

এ উপন্যাসে মুর্শেদ আলীর সন্তান হেনু রায়হানের মধ্যে বাঙালির আত্মপরিচয়-লালনের প্রসঙ্গ উন্মোচিত হয়েছে। সে জন্মগতভাবে ভারতীয়, জাতিগতভাবে বাঙালি এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলমান। কোন পরিচয় তার নিকট বড়ো, সেটি তার জ্ঞানতৃষ্ণা, কর্মপ্রচেষ্টা ও গভীর জীবনবোধের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। সবকিছুর ওপরে সে নিজের জাতিগত পরিচয়কে বড়ো করে দেখেছে। নতুন দেশ পূর্ববাংলায় তাঁর আগমন, কলেজে সাম্যবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও পরবর্তী সময়ে জেলজীবন বরণ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তার চেতনাগত পরিবর্তন পরিদৃশ্যমান হয়েছে। লেখকের ভাষায়:

> হ্যাঁ, সে তো এখানে আগন্তুক নয়, এ দেশেরই মানুষ সে। এখন সে ঘরে ফিরছে। চারপাশের মানুষজন, গাছপালা, ঘরবাড়ি মাথার ওপরকার আকাশ আর ভাসমান মেঘ, সব কিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক। কমরেডরা তো ঠিকই বলেছেন, এই জগৎ আর জীবনের কথাই তাকে বলতে হবে আর লিখতে হবে। (শওকত ২০১৭: ২১৬)

তার মধ্যে মানুষের জন্য কাজ করা ও গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কৃত্রিম সীমারেখা রাজনীতির শিকার হয়নি হেনু রায়হান; সে তার চেতনায় ধারণ করেছে বাঙালির স্বাধিকার ও আত্মপরিচয়ের নবচেতনা। তার মনোভুবনে মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রত্ন-বাঙালির স্বভাব। এটা যেমন নতুন আবাসের ভিত রচনার উপন্যাস, তার চেয়ে অধিক বাঙালির জাতিগত পরিচয় অন্বেষণের উপন্যাস।

দেশভাগের সময় সীমান্তে দেশত্যাগরত অসংখ্য মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন, সীমাহীন বৈষম্য ও অত্যাচারমূলক আচরণ করা হয়েছে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়েছে তা সফল না হয়ে অল্প দিনের মধ্যে দুই বাংলার মানুষের নিত্য দিনের জীবনকে করেছে যন্ত্রণাজর্জর ও হতাশানির্ভর। নিজের চেতনার সঙ্গে অবিরত লড়াইয়ে হারতে হয়েছে সরল সাধারণ মানুষকে। একটু স্বস্তির আশায়, জীবনের নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষায় তারা জীবনে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছে। *বসত* উপন্যাসেও উঠে এসেছে একটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের ওপর এমন মনোভাব। ধর্মের সাথে বাঙালি জাতির কোনো বিরোধ নেই। তবুও দেশভাগের সময় ধর্মের দ্বারায় নির্ণিত হয়েছে মানুষের জীবন ও আবাস। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, এই বিভেদের মূলে বিদ্যমান ছিল ক্ষমতা-কাঠামো। ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শ তার চেতন জগতে ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং ভৌগোলিক অস্তিত্বকে সংকটে ফেলেছে। দেশত্যাগের কষ্ট, উদ্দেশ্যহীন যাত্রা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

মধ্যেও সীমান্তে তাদেরকে হয়রানি করা হয়েছে। ঘরছাড়া, বাস্তুহারা ও অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে। তারা যে সহায়-সম্বলহীন তা নয়, তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। বস্তুত এখানে প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির উদ্বাস্তু জীবনের সমস্যা।

চিকিৎসক মুর্শেদ আলী প্রধান তার সন্তানদের নিয়ে মালপত্রসহ সীমানা কীভাবে অতিক্রম করেছে তার ইতিবৃত্ত দেখানো হয়েছে। সে নিজে দেশত্যাগ না করে বড়ো মেয়ে, মেজো ছেলে এবং ছোটো দুই ছেলেকে পাঠিয়েছে। সে প্রথমদিকে নিজের স্বদেশ ছেড়ে আসেনি। সে দেশভাগের বিরোধী ছিল। সে তার ১৪ বছরের বালকপুত্র রায়হানকে ভরসা করে মনিরা খাতুন ও ছোটো ছেলেমেয়েদের দিনাজপুরে পাঠিয়েছে। তার বংশের পূর্বপুরুষেরা ভারতের মাটিতে জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেছে। জন্মভূমির জন্য সে যোগ দিয়েছে কংগ্রেসে। ভারতের আবাস ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় মুর্শেদ আলীর পরিবার ও অন্যরা যে অকথ্য নির্যাতন ও বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে তার প্রতিচ্ছবি এখানে দেখানো হয়েছে। তাদের সহায়-সম্বল সীমান্তে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের দেশ হয় অন্যের দেশ, নিজেদের জিনিসপত্র পরিচিতি পায় পাচার করা জিনিস হিসেবে। সীমান্তের স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ চতুরতার সাথে যাত্রীদের মালামাল লুট করেছে। তাদের দেশ ছেড়ে সীমান্ত পার হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও তাদের মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি অস্তিত্বহীনতায় ফেলেছে এবং কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে জাতিগত সত্তাকে।

যে কোনো দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু না কিছু পটপরিবর্তনকারী ঘটনা বা অনুষঙ্গ থাকে, যা ওই দেশের চিরায়ত ইতিহাসের নিদর্শন হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ইতিহাস বাঙালি জাতির ইতিহাসে তেমনই এক ঐতিহাসিক অনবদ্য ঘটনা। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ থেকে বঙ্গদেশে বারবার ভৌগোলিক সীমানা ও ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ঘটেছে; তা যে কারণেই হোক না কেন এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়েছে। যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মকেন্দ্রিকতানির্ভর মতাদর্শিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য বাংলা অঞ্চলের ভূখণ্ডকে বহুবার বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এসব ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন জাতির সত্তাগত, পরিচয়গত, ভাষাগত ও সর্বোপরি জাতিগত পরিচয় সংকট ও হুমকির মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশের ও বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাস অন্বেষণ করতে হলে অতীতমুখী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে অন্য যে কোনো বিষয় আলোচিত হলেও এর মূলে বিদ্যমান থাকে বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধান, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-অন্বেষণের প্রচেষ্টা। বাঙালি সংগ্রামী জাতি হিসেবে ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। আর এ সংগ্রামের পেছনে রয়েছে তাদের অসীম আত্মত্যাগ। বাঙালি জাতি কখনো বীরের বেশে হাজির হয়েছে, আবার কখনো পরাজয়ের গ্লানি বহন করেছে। শওকত আলীর ব্যক্তিজীবনেও এমনই ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে দেশভাগ তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে গভীর বেদনার অনুভূতি। আলোচ্য প্রবন্ধে যেসব উপন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনাবেগের অনুষঙ্গে বাঙালি জাতির প্রকৃত সত্তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। শওকত আলী দেশপ্রেমের আলো নিয়ে খুঁজেছেন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নিজের অতীতকে ও বাঙালি জাতিসত্তাকে।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০২৩)। 'বাঙলি জাতি', *বাঙলাদেশ* (মনসুর মুসা সম্পাদিত)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আহমদ রফিক (২০১৫)। 'দেশবিভাগের পটভূমিতে বাঙালি জাতিসত্তা', *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ

আহমদ রফিক (২০১৫)। 'দেশভাগ ও উদ্বাস্তুকথা', *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ

আহমদ শরীফ (২০০১)। 'বাঙলা ও বাঙালী', *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*। ঢাকা: অনন্যা

চঞ্চল কুমার বোস (২০১৫)। *শওকত আলীর কথাসাহিত্য জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০২২)। *বাঙালি সত্তা নির্মাণে বিনির্মাণে*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

নীহাররঞ্জন রায় (১৪২৫)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

রফিকউল্লাহ খান (২০১৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

রমেশচন্দ্র মজুমদার (২০২৪)। *বাংলা দেশের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ

রূপদত্তা রায় (২০১৬)। 'ওয়ারিশ: ইতিহাসের ভিন্নপাঠ', *গল্পকথা* (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

শওকত আলী (২০১৭)। *শওকত আলী রচনা সমগ্র ষষ্ঠ খণ্ড* (মোহাম্মদ হাননান সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন

শওকত আলী (২০১৮)। *শওকত আলী রচনা সমগ্র সপ্তম খণ্ড* (মোহাম্মদ হাননান সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন

শওকত আলী (২০১৮)। *শওকত আলী রচনা সমগ্র নবম খণ্ড* (মোহাম্মদ হাননান সম্পাদিত)। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন

শওকত আলী (২০১৭)। *বসত*। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ

শাফিক আফতাব (২০১৪)। *শওকত আলীর উপন্যাস কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য*। ঢাকা: ভাষাচিত্র

সিরাজুল ইসলাম (২০২৩)। 'আলোচনা', *বাঙলাদেশ* (মনসুর মুসা সম্পাদিত)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

সিরাজ সালেকীন (২০২২)। *ভাটির দেশের বাঙাল*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০২৩)। 'বাঙলাদেশ', *বাঙলাদেশ* (মনসুর মুসা সম্পাদিত)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

হুসাইন মুনীর (২০১৬)। 'শওকত আলীর উপন্যাস: একটি সাধারণ পর্যালোচনা', *গল্পকথা* (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

Chatterji, Joya (1994). 'Introduction', *Bengal Divided Hindu Communalism and partition: 1932-1947.* United Kingdom: Cambridge University Press